সিরিয়ায় ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের জন্যে সহমর্মিতা

আবসার মাহফুজ

নিজ দেশে যেমন নানা ধরনের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে অসহায় ফিলিস্তিনিরা, তেমনি দেশে দেশে ছড়িয়ে থাকা ফিলিস্তিনি শরণার্থীরাও নানা ধরনের হয়রানি ও মানবাধিকার বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এখন গৃহযুদ্ধ কবলিত সিরিয়ায় ফিলিস্তিনি শরণার্থীরা চরম খাদ্যাভাবের শিকার হয়ে দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সিরিয়ায় আটকে পড়া ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মূলত খাদ্যের অভাবে এ পর্যন্ত ১৫ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মবিষয়ক সংস্থা। জাতিসংঘের ত্রাণবিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডাব্লিউএ-এর মুখপাত্র ক্রিস গানেস সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এ সপ্তাহান্তে দামেস্কের ইয়ারমুক শিবিরে আরো কমপক্ষে পাঁচজন ফিলিস্তিনি শরণার্থীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর আগে খাদ্য এবং ওষুধপত্র পাঠাতে না পারায় গত সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত আরো দশ জনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছিল সংস্থাটি। ক্রিস গানেস বলেন, জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ পাঠাতে না পারলে সেখানে মৃতের সংখ্যা আরো বাড়বে। সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে এক লাখের মতো মানুষ।

সম্প্রতি সেদেশে কথিত রাসায়নিক হামলায় কয়েকশত মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ। সিরিয়ায় সামরিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। প্রশ্ন হচ্ছে, সম্ভাব্য হামলা কি সেদেশে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে? সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের দক্ষিণের ওই অঞ্চলটি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে এলাকাটি ঘিরে রেখেছে প্রেসিডেন্ট বাসার আল-আসাদের অনুগত বাহিনী। ফলে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলো শরণার্থীদের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাতে পারছে না। এ কারণে ২০ হাজারের মতো ফিলিস্তিনী শরণার্থী পড়েছেন চরম সংকটে। পুষ্টিহীনতা দেখা দিচ্ছে মারাত্মকভাবে, দিন দিন মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস এর তথ্য মতে, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ইয়ারমুক শিবিরে মারা যাওয়াদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, একজন প্রতিবন্ধী এবং একজন নারী রয়েছে। দক্ষিণ দামেস্কের এই শরণার্থী শিবির সম্পর্কে কয়েকদিন আগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন ইউএনআরডাব্লিউএ-এর প্রধান ফিলিপ্পো গ্রান্ডি। সেখানকার শরণার্থীদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে এ কথা জানিয়ে দ্রুত ত্রাণ পাঠানোর ব্যবস্থা না করলে শিশুসহ কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ রক্ষা করা যাবে না বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সিরিয়ায় পাঁচ লক্ষের মতো ফিলিস্তিনি শরণার্থী রয়েছে। তাদের অর্ধেকেরও বেশি চলমান যুদ্ধের কারণে গৃহহারা। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ থেকে শুরু হওয়া এ যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১ লাখ ২৬ হাজার মানুষ মারা গেছে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক নানা চাপ সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দুনিয়ার প্রশ্রয়ের কারণে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান হয়নি আজও। ফিলিস্তিনীদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায্য অধিকারের ব্যাপারে কারো দ্বিমত না থাকলেও তা অর্জনে বাধার সৃষ্টি করছে ইসরাইল ও তার পশ্চিমা দোসররা। প্রায় প্রতিদিনই ইসরাইলি হামলার শিকার হয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন নিরীহ ফিলিস্তিনীরা। ফিলিস্তিনীরা শান্তির লক্ষ্যে বিশাল ছাড় দেওয়ার পরও ইসরাইলের 'গা জোয়ারি' নীতির কারণে বার বার শান্তি হাতছাড়া হয়েছে। ইসরাইলের নির্যাতন থেকে যুবকশ্রেণির পাশাপাশি শিশু-নারী এবং বয়োবৃদ্ধরাও রেহাই পাচ্ছে না। জাতিসংঘ শিশুবিষয়ক তহবিলের (ইউনিসেফ) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরাইলের নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যদের হাতে আটক ফিলিস্তিনি শিশুদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে নির্দয় আচরণ করা হচ্ছে। যা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরাইয়েলের সেনাবাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যরা গড়ে প্রায় ৭০০ ফিলিস্তিনি শিশুকে আটক করে। এদের বয়স ১২ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী অধিকাংশ শিশুকেই পাথর ছোঁড়ার দায়ে আটক করা হয়। ইউনিসেফ বলছে, আটক ফিলিস্তিনি শিশুদের সঙ্গে ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা নিষ্ঠুর, অমানবিক ও জঘন্য আচরণ করেছে–এমন বেশ কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। যা আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার ও নির্যাতনবিরোধী সনদ অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। ইউনিসেফ ২০০৪

খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪ শতাধিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে। রিপোর্টে বলা হয় সাধারণত গভীর রাতে ইসরাইলের ভারী অস্ত্রধারী সেনারা ফিলিস্তিনি শিশুদের আটক করে। আটকের পর থেকেই এসব শিশুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা শুরু হয়। আর বিচার প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে এই দুর্ব্যবহার চলে। রিপোর্টে আরো বলা হয়, দুর্ব্যবহারের ধরনের মধ্যে রয়েছে আটকের পর শিশুদের চোখ বেঁধে ফেলা এবং হাতে প্লাস্টিকের হাতকড়া পরানো। এরপর শারীরিক ও মৌখিকভাবে আক্রমণ চালানো। আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে এসব শিশুকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই নির্দয় আচরণ চলে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় শিশুদের নির্যাতন করাসহ নানা ধরনের হুমকি দেয়া হয়। শিশুদের জন্যে আইনজীবী নিয়োগেরও কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। শিশুদের জামিনও দেয়া হয় না। দণ্ডাদেশ দেয়ার পর এসব শিশুকে অধিকৃত পশ্চিম তীর থেকে ইসরাইলের আটককেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। পাশবিক হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি ৩ মাসের ফিলিস্তিনি শিশুও। এই নারকীয় হামলার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠলেও যুক্তরাষ্ট্র বরাবরের মতোই ইসরাইলের অন্যায় কাজের পক্ষে সাফাই গেয়েছে। ফিলিস্তিনিদের নিধনে তারা নানাভাবেই মদদ দিচ্ছে ইসরাইলকে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আশকারা পেয়ে ইসরাইল এখন পূর্বাপেক্ষা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এসব বিষয়ে জাতিসংঘ মাঝে-মধ্যে কিছু হুশিয়ারি উচ্চারণ করলেও ইসরাইলকে নিবৃত করতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

উপরন্তু কোনো আরব দেশ ইসরাইলের অবৈধ তৎপরতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও নিন্দা প্রস্তাব আনলে তাতে 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্র তা বানচাল করে দিয়েছে। এ অবস্থায় ফিলিস্তিনিরা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের 'জন্মসনদ' এর জন্যে জাতিসংঘের শরণাপন্ন হয় যুক্তরাষ্ট্রের চোখ রাঙানি সত্ত্বেও। ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনিদের উদ্যোগ ব্যর্থ করতে নানামুখি ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু জাতিসংঘে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জনের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদেরই জয় হয়েছে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের দীর্ঘ ১৮ মাসের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর ফিলিস্তিনকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত বেশ কয়েকটি দেশ এবং রাশিয়া, চীন, ভারতসহ মোট ১৩৮টি দেশ, বিপক্ষে ভোট দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলসহ ৯টি দেশ। যুক্তরাজ্য ও জার্মানসহ ৪১টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। অনুপস্থিত ছিলেন ৫টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। ফিলিস্তিনিদের এই বিজয়কে বিশ্লেকরা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের জন্য একটি বিশাল কূটনৈতিক পরাজয় হিসেবে দেখছেন। এখন ফিলিস্তিনে ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আপরাধ আদালতে (আইসিসি) যেতে নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের আর বাধা রইলো না। এখন ফিলিস্তিন আইসিসিসহ জাতিসংঘের বহু সংস্থার সদস্যপদ পেতে পারবে। এখন থেকে ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি জাতিসংঘ অধিবেশনের বিতর্কে অংশ নিতে পারবে। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস সাধারণ পরিষদের এই ঐতিহাসিক রায়কে সার্বভৌম ফিলিস্তিনের 'জন্মসনদ' বলে অভিহিত করেছেন। সাধারণ পরিষদের এ রায় ফিলিস্তিনকে অন্য ধরনের উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এ রায় স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর বিটিশশাসিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে দুই ভাগে ভাগ করে একভাগে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ওপর ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল জাতিসংঘে। সে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়েছিল ইসরাইলের পক্ষে। সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা বিশ্বের চাপেই এ রায় গিয়েছিল ইসরাইলের পক্ষে। জাতিসংঘের ১৮১ নম্বর প্রস্তাবের 'তথাকথিত 'বিভাজন পরিকল্পনা'র মাধ্যমে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অখণ্ড ফিলিস্তিনকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। ইসরাইল ও ফিলিস্তিন নামের দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্মের কথা বলা হয় ওই প্রস্তাবে। কিন্তু জাতিসংঘ ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিলেও ফিলিস্তিনকে দেয়নি। ইসরাইল সম্প্রসারণবাদী নীতির মাধ্যমে পুরো ফিলিস্তিন দখলের অপচেষ্টা চালায়। এতে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে ফিলিস্তিনিদের সাথে। আর ইসরাইলের এ অন্যায় কাজে সাহায্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাইল সামরিকভাবে দুর্বল আরব দেশগুলোর ভূখণ্ড দখল করে নেয়। এ পটভূমিতে জাতিসংঘে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত হয় ১৯৪ নম্বর প্রস্তাব। প্রস্তাবে নিজ নিজ ভূখণ্ডে থেকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের শর্তে উদ্বাস্তুদের বাড়ীঘরে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া, জেরুজালেমের নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিকীকরণ, ধর্মীয় স্থানগুলোর নিরাপত্তা এবং সেখানে মানুষের অবাধ প্রবেশাধীকারের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠার আহবান

জানানো হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘে গ্রহণ করা হয় ২৪২ নম্বর প্রস্তাব। এতে আরবদের কাছ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে দখল করে নেয়া ভূখণ্ড থেকে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহার করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ৩২৩৬ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের হস্ত ক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বাধীন-সাবভৌমত্ব, নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পদের মালিকানা ফিরে পাওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত ৪৬৫ নম্বর প্রস্তাবে পশ্চিম তীর, গাজা ও গোলান মালভূমিসহ দখলকৃত স্থানে নিজ দেশের জনগণের একাংশ ও নতুন অভিবাসীদের পুনর্বাসন করার ইসরাইলি নীতির নিন্দা জানানো হয়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত ৬৮১ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে পুরোনো জেরুজালেমে রক্তাক্ত সহিংসতার পর গৃহীত ফিলিস্তিনিদের নির্বাসিত করার ইসরাইলি সিদ্ধান্তের নিন্দা জানানো হয়। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত ১৩৯৭ নম্বর প্রস্তাবে ইসরাইল-ফিলিস্তিনের দ্বন্দ্ব অবসানে এই দুই রাষ্ট্র নিরাপদ ও স্বীকৃত সীমান্তের অধীন পাশাপাশি অবস্থান করবে বলে দৃঢ় মত দেয় সদস্যরাষ্ট্রগুলো। এরকম আরো অনেক প্রস্তাব জাতিসংঘে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু কোনেটির প্রতি ইসরাইলের ন্যূনতম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি। যার কারণে ইসরাইল রাষ্ট্রকে মেনে নিয়েও একটি স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্ম হতে পারেনি দীর্ঘ ৬৫ বছরেরও।

বর্তমান সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর নাম 'ফিলিস্তিনী'। ফিলিস্তিনীরা আজ নিজ দেশেই পরবাসী। জায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলের দমন-নিপীড়ন ও গণহত্যার শিকার ফিলিস্তিনিরা প্রাণ বাঁচাতে আজ নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে দেশে দেশে উদ্বাস্তু জীবন বেছে নিয়েছে। একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্যে সুদীর্ঘ ৬৫ বছর অপেক্ষা করেও তারা পায়নি তাদের স্বপ্নের দেশ। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সহায়তায় ইসরাইল দখল করে আছে পুরো ফিলিস্তিন। দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূমিতে তারা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে একের পর এক ইহুদি বসতি নির্মাণ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিদের এনে পুনর্বাসন করে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের ফসল ও ফলবান বৃক্ষ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। গাজা ও পশ্চিম তীরসহ বিভিন্ন এলাকায় নানা ছুঁতোয় আরোপ করছে অর্থনৈতিক অবরোধ। অবরোধের কারণে খাদ্য ও ওষুধের অভাবে প্রতিদিনই মারা যাচ্ছে শত শত ফিলিস্তিনি শিশু ও বয়স্ক মানুষ। একের পর এক বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে অসহায় ফিলিস্তি নিদের বাড়িঘর। ইসরাইলি সৈন্যদের বুলেটবিদ্ধ হয়ে প্রতিদিনই মারা যাচ্ছেন শত শত ফিলিস্তিনি। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সকল আইনে ইসরাইলের এই তৎপরতা চরম অপরাধ হিসেবে গণ্য। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অসহায় নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় কেউই এগিয়ে আসছে না। এটি মানব-মর্যাদা ও মানব-সভ্যতার জন্যে চরম অবমাননাকরই বলতে হয়। আমরা এই নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে একাট্টা হওয়ার জন্যে বিশ্বসম্প্রদায়ের সুদৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

লেখক: দৈনিক পূর্বকোণের সহকারী সম্পাদক